পরশুরামের বৈঠকি গল্প

অলোক রায়

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) যিনি গল্পলেখার সময়ে 'পরশুরাম' নাম গ্রহণ করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অপ্রগল্ভ, স্বল্পবাক্, কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অথচ তাঁর অধিকাংশ গল্প হাসির গল্প। আর সেই গল্পের একটা বড়ো অংশ বৈঠকি গল্প। তাঁর জীবনী থেকে জানি, ১৪ নম্বর পার্শিবাগান লেনে তাঁদের বাড়িতে এক আড্ডা গড়ে ওঠে, প্রথমে যার নাম ছিল Calcutta Arbitrary Club, পরে যার নাম হয় উৎকেন্দ্র সমিতি। সমিতির সভাপতি ছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, যিনি নিজের হাতে চা তৈরি করে সকলকে খাওয়াতেন। এখানে দাবা ও তাসের সঙ্গে সাহিত্য শিল্প কাব্য মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হত। রাজশেখর তখন মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিকেল কারখানা - সংলগ্ন বাড়িতে থাকতেন (কিছুদিন সুকিয়া ষ্ট্রিটে ভাড়াবাড়িতেও থেকেছেন), তবে প্রত্যেক রবিবার উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডার অ াকর্ষণে পার্শিবাগান আসতেন। আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন দাদা শশিশেখর বসু। ভাই গিরীন্দ্রশেখর বসুও উপস্থিত থাকতেন। অন্যান্য যাঁরা আড্ডায় নিয়মিত অংশ নিতেন, তাঁদের মধ্যে জলধর সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, ড. সত্য রায়, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্ যায়ের নাম করা যায়। মাঝে মাঝে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুম ার চট্টোপাধ্যায়। উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডায় পরশুরাম গড্ডলিকার গল্পগুলি পড়ে শোনাতেন। পরে ১৪ নম্বর পার্শিবাগ ান তাঁর গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে ১৪ নম্বর হাবসিবাগানে। কজ্জলী গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা'র কথা মনে পড়বে, 'চৌদ্দ নম্বর হাবসিবাগান লেনের মেসটি ছোট্ট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সবদিকে তার কড়া নজর আছে। মেসের অধিবাসী পাঁচ - ছয়জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভালো। বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাতে ঢালা ফরাস এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র,দাবা, তাস, পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সজ্জিত আছে।' আড্ডার উপযোগী পরিবেশ রচনায় পরশুরাম তৎপর। 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পে 'নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন, সেজন্য বালাপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের ও চা পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখনপান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।' আড্ডায় অংশ নিয়েছে গুপী, বঙ্কু, ষষ্ঠী, নিধু।

আড্ডার পরিবেশ একবার সৃষ্টি হয়ে গেলে কথকের মুখে বিচিত্র রসের গল্প তৈরি হতে আর সময় লাগে না। পরশুরাম দুধরনের গল্পের কথা বলেছেন---- 'প্রথম শ্রেণীর গল্প রূপকথা জাতীয়, প্লটে যতই জটিলতা আর রোমহর্ষণ থাকুক, পরিশেষে পূর্ণ শান্তি, নায়ক - নায়িকার শারীরিক মানসিক আথিক সর্বাঙ্গীন কুশল। পড়া শেষ হলে পাঠক হয়তো মনে মনে কিছুক্ষণ রোমন্থন করেন, কিন্তু তারপরে নিশ্চিন্ত হন, কারণ নায়ক - নায়িকার ভবিষ্যৎ একেবারে নিষ্কন্টক। দ্বিতীয় শ্রে ণীর গল্পের নায়ক - নায়িকা অল্পাধিক আঘাত পায়, তার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সারে না। লেখক মিলনান্ত করে গল্প সমাপ্ত করলেও কিছু কন্টক রেখে দেন, তার ফলে পাঠকের মনে গল্পের জের চলতে থাকে। এই শ্রেণীর সকন্টক গল্পকেই বোধ হয় মনস্তত্ত্বমূলক বলা হয়।' ('গল্পের বাজার', চলচ্চিন্তা')। পরশুরাম প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখতে ভালোবাসতেন, অথবা বৈঠকি গল্প সাধারণত নিষ্কন্টক গল্পই হয়ে থাকে। এখানে রূপকথার সঙ্গে বৈঠকি গল্পের সাদৃশ্য। 'কামরূপিনী' গল্পে শীতুমামা যে

গল্প বানিয়েছেন তাকে রূপকথা বললে অন্যায় হয় না। শীতুমামা অবশ্য গোড়াতেই বলে নেন ‘রূপকথার সবটাই মিথ্যে এমন বলা যায় না। যা ঘটতে পারে তাই কতক রটে।’ অবশ্য কামাখ্যার মায়াবিনী যারা ভেড়া বানিয়ে দেয়, তারপর সেই ভেড়ার মাংসে কাটলেট ফ্রাই পাই চপ শিককাবাব বানায় -- সবটাই শীতুমামার গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু শোনাবার সময়ে তো তা মনে হয় না, তাই সুখাদ্যও হয়ে যায় ‘ও আক থু!’ বকবক্তা সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্যের আত্মকথা যথার্থ নিষ্কন্টক গল্প -- তণ সিদ্ধিনাথের সিনেমা অভিনেত্রী তিলোত্তমার প্রেমে পড়া এবং গু রামদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চুর কৃপায় মোহমুক্তি। তবে এর মধ্যে কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা বলা মুশকিল। গল্পের শেষে--- নমিতা বললেন, আপনার গিন্নিকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবনস্মৃতি তাঁকে
বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই। আমার কোনও কথাই
তিনি বিশ্বাস করেন না।
---জীবনস্মৃতি না ছাই, বকবক করে আবোলতাবোল বানিয়ে
বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি। (তিলোত্তমা)

এই ধারার শ্রেষ্ঠ গল্প ‘যদু ডাক্তারের পেশেন্ট’। ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠকে সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ির স্মৃতিচারণ। শ্রোতা তণ ডাক্তারেরা -- হরিশ চাকলাদার, বেণী দত্ত, অশ্বিনীকুমার সেন। যদু ডাক্তারের বয়স নববই, শরীর ভালোই আছে, তবে কানে একটু কম শোনেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল দেখে আবোল - তাবোল বকেন। তাঁর গল্পটি বিভীষিকা সার্জারি আর প্রেমের আশ্চর্য সম্মিলন। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়েছে পঞ্চী আর জটিরামের, কিন্তু বিঘোরবাবা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে তাদের সূক্ষ্মশরীর আটকে রাখেন, যদু ডাক্তারকে খণ্ডযোজনের সুযোগ দেওয়ার জন্যে। তারপর ডাক্তার ভোঁতা গুণ-ছুঁচ আর খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে মাথা আর ধড় জুড়ে দিলেন, তবে বিঘোরবাবার নির্দেশে পঞ্চীর মাথার সঙ্গে জটির ধড় আর জটির মাথার সঙ্গে পঞ্চীর ধড়। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া --- কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। ফ্ল্যাবারগাস্টিং মিরাক্‌ল। অতি খাসা, পরকীয়া প্রেমের এমন পারফেক্ট পরিণাম বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই, আর সিম্বায়োসিসের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বায়োলজির কেতাবেও পাওয়া যায় না। তবে এই অসামান্য গল্পের বীজ হয়তো লুকিয়ে আছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুচরিতে, যেখানে ভিখু ডাক্তার ডমরু ঊর্ধবাঙ্গ ও একটি গরু নিম্নাঙ্গ জুড়েছেন তাঁর চমৎকার ওষুধে --- ‘ওষুধের গুণে সেই গরু কোমর ও পা আমার শরীরে জুড়িয়া গেল। তাহার পর আর দুইটি বড়ি তিনি আমার মুখে দিলেন। তাহা খাইয়া আমি শরীরে বল পাইলাম। কিন্তু মানুষের মতো গরু দুই পায়ে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গরু দুই পা আমার দুই হাত মাটিতে পাতিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আমাকে দাঁড়াইতে হইল। দুজনেরই কাহিনীর উৎস গণেশ ও দক্ষের পৌরাণিক কল্পনা।

জটাধর বক্‌শীকে নিয়ে পরশুরাম তিনটি গল্প লিখেছেন। জটাধর - গল্পমালার মধ্যে অসামান্য সম্ভাবনা ছিল। নতুন দিল্লির গোল - মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকিরাম নামে গলির মোড়ে কালিবাবুর ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। সন্ধ্যাবেলা এখানে চা - পিপাসু আড্ডাধারী কয়েকজনের নিত্য সমাগম ঘটে, যাঁদের মধ্যে আছেন পেনসনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুলমাস্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাঙ্কের কেরানি বীরেশ্বর সিঙ্গি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার ও আরও অনেকে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের জনকয়েক পাশা খেলেছেন, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ বা রাজনীতিক তর্ক করেছেন। এর মধ্যে একজন অচেনা লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, ছ’ফুট লম্বা, মজবুত গড়ন, মোচড় দেওয়া মোটা কাইজারী গোঁফ। গায়ে কালচে-খাকী মিলিটারি ওভারকোট, পরনে ইজার আছে কি ধুতি আছে বোঝা যায় না, মাথায় পাগড়ির মত বাঁধা কম্ফর্টার। বাজখাই গলায় নিজের পরিচয় দিলেন -- জটাধর বকশী। দ্বিতীয়বার আবির্ভাবে অধিকন্তু কপালে গুটিকতক চন্দনের ফুটকি আর গলায় একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। শেষবার ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে তাঁর প্রবেশ সন্ন্যাসীবেশে --- ‘ছ ফুট লম্বা মজবুত গঠন, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা চুল, মোটা গোঁফ, কোদালের মতন কাঁচা - পাকা দাড়ি, কপালে ভস্মের ত্রিপুন্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কানঢাকা গেয়া টুপি, গায়ে গেয়া আলখাল্লা, পায়ে গেয়া ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে একটি অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড কমণ্ডলু বা হাতলযুক্ত বদনা।’ জটাধর প্রথমবার মুখুজ্যেমশাইর সঙ্গে বাজি রেখে, তাঁকে ও তাঁরবন্ধুদের ভূত দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বর্মা থেকে চীন পর্যন্ত যে রাস্তা, তার জরিপের ক

াজে নিযুক্ত ছিলেন জটাধর। সেখানে জাপানিদের হাতে ধরা পড়ে কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের আদেশে জটাধর ও তাঁর সঙ্গীদের স্ট্রিকনীনের বড়ি খেতে হয়।

---তারপর দুটো জাপানি আমাদের হাত পা ধরে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দিল। আর দুটো জাপানি তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ---

বীরেশ্বরবাবু মাথা চাপড়ে চিৎকার করে বললেন ওরে বাপ রে বাপ? --- হ্যাঁ মশাই, তলোয়ারের চোপ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে অ ামাদের মুণ্ডু কেটে ফেললে।

রামতারণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তবে বেঁচে আছেন কি করে?

বজ্রগম্ভীরস্বরে জটাধর বক্‌শী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি?

আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করে, চেটে পুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনীনের তেতো টেরই পেলে না। তারপর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানি কনভলশন হয়ে পটপট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, আশর্চ্য দূরদৃষ্টি। (জটাধর বক্‌শী)

দ্বিতীয়বার জটধর বক্‌শী তাঁর বিবাহসঙ্কটের কাহিনী শুনিয়ে শ্রোতাদের স্তম্ভিত করেছেন। অচলার স্বামী বারো বছর নিদ্দেশ, জটাধর এতদিন অচলাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তারপর লোকনিন্দার ভয়ে ও অচলার ইচ্ছায় যেদিন সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন, ঠিক সেইদিন অচলার পূর্বস্বামী বলহরি এসে উপস্থিত। অবশ্য সব ব্যাপারটাই সাজ ানো। জটাধর এদিন চায়ের দোকানে ঢুকেই প্রথমে জানিয়েছিলেন, 'মশাইরা নভেল পড়ে থাকেন নিশ্চয়? প্রেমের গল্প, বড় ঘরের কেচ্ছা, ডিটেকটিভ কাহিনী, রূপসী বোম্বেটে, এইসব? তারজন্যে কিছু পয়সাও খরচ করে থাকেন। কিন্তু বলুন তো, গল্পের বই - এ কিছু সত্য কথা পান কি ? আজ্ঞে না, আপনারা জেনেশুনে পয়সা খরচ করে ডাহা মিথ্যে কথা পড়েন, তা শরৎ চাটুজ্যেই লিখুন আর পাঁচকড়ি দে-ই লিখুন। কেন পড়েন? মনে একটু ফুর্তি একটু সুড়সুড়ি একটু টিপুনি একটু ধাক্কা লাগাবার জন্যে। গল্পে হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাই মলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়। আমি কি - এমন অন্যায় ক াজটা করেছি মশাই? রামতারণবাবু প্রবীণ লোক, ওঁকে ভক্তি করি, ওঁর সামনে তো ছ্যাবলা প্রেমের কাহিনী বলতে পারি ন া, তাই নিজেই নায়ক সেজে একটি নির্দোষ পবিত্র ভূতের গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলুম।....ছ -সাত টাকার কমে আজক াল একটা ভালো গল্পের বই মেলে না সার। আমি সেদিন অতি সস্তায় আপনাদের মনোরঞ্জন করেছিলুম।' 'জটাধরের বিপদ' গল্পে অবশ্য আড্ডাধারীদের খরচ কিছু বেশি হয়েছে। জটাধর নিজে বারোটা চপ, চারখানা কেক, চারটে বড়ো পেয় ালা চা খেয়েছে, আর বউকে দেবে বলে নিয়ে গেছে সাতটা চপ। জটাধরের হিসেব মতো দেড়খানা উপন্যাসের দাম। 'চাঙ্গ ায়নী সুধা' জটাধর কানহাইয়া বাবার শিষ্য হিসেবে মন্দির স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহে বেরিয়েছেন। ক্যালকাটা টি ক্যা বিনের আড্ডাধারীরা বারবার দু'বার ঠকেছেন, রামতারণবাবু গোড়াতেই বলে রাখলেন, 'আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না তা আগেই বলে রাখছি। তোমাকে থোড়াই বিশ্বাস করি।' কিন্তু জটাধরের চাঙ্গায়নী সুধার প্রলোভন কেউই দমন করতে পারলেন না। চাঙ্গায়নী সুধা কালু মহারাজের আবিষ্কার,না অ্যাংলো মোগলাই হোটেলের ম্যানেজার রাইচরণের ভাগ্নে কানাই - এর আবিষ্কার তা খুব নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। তবে 'রাজভোগ' গল্পটি অনেক আগে লেখা, সেখানে র াইচরণ জানান -- 'শরবতটি সেই কানাই ছোকরারই পেটেন্ট, সে তার নাম দিয়েছে -- চাঙ্গায়নী সুধা...। চাঙ্গায়নী সুধায় কি কি আছে শুনবেন? কুড়িটা কবরেজি গাছ - গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারি আরক, কুড়ি দফা হেকিমি দাবাই, হীরেভস্ম সোনাভস্ম মুক্তোভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকটিরি --- এইসব মিশিয়ে চোলাই করে তৈরি হয়।' জটাধর চাঙ্গায়নী সুধার ফর্মুলাকে আর একটু চমকপ্রদ করেছেন, যদিও তার স্বরূপ অস্পষ্ট থাকেনি ---'এতে আছে কুড়িটি কবরেজি গাছ -গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারি আর, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমি দাবাই, তাছাড়া তা ন্ত্রিক স্বর্ণভস্ম রীরকভস্ম বায়ুভস্মব্যোমভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত সে ামলতা, যাকে আপনারা সিদ্ধি বলে, আরকাশ্মীরী মকরন্দ। এইসব মিশিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে। কানু ঠাকুর বলেন, এই চাঙ্গায়নী সুধাই হচ্ছে প্রাচীন ঋষিদের সোমরস, উনি শুধু ফর্মুলাটি যুগোপযোগী করেছেন।' আজগুবি গল্পের সঙ্গে চাঙ্গায়নী সুধা সহজেই খাপ খেয়ে যায়। এই সুধা পান করে আড্ডাধারীদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, জটাধর অনায়াসে মন্দিরের ফাণ্ড তৈরির কাজে সক্ষম হয়েছেন।

তবে পরশুরামের বৈঠকি গল্পের ধারায় ত্রৈলোক্যনাথের ডমধরের যোগ্য উত্তরাধিকারী কেদার চাটুজ্যে। অবশ্য চাটুজ্যেমশাই রূপেগুণে বিদ্যায়বুদ্ধিতে বিশেষত কল্পনাশক্তির সমুন্নতিতে বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। মেমসাহেবের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় দেখা হওয়ার পর চাটুজ্যে মশাইর প্রতিক্রিয়া ---

এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশকোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনও ঘটেনি। ষাট বছর বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয়নি, মুখ যেন কদমফুল--- কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনি করে দিলে। থাকতে না পেরে বললুম -- মেমসাব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু করে হেসে বললেন -- কুছ নেই, নো অফেন্স। তুম কোন্ হ্যায় বাবু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বললুম--- আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'লম্বকর্ণ' গল্পে। রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিন্দার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের 'বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজ্য - উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর - খুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির--- কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাতদিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল।' বৈঠকে নিয়মিত সদস্যদের মধ্যে আছেন বংশলোচনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল, শ্যালক নগেন, দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে উদয় এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজে। চাটুজ্যে মশাই এই গল্পে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেননি, যেমন লম্বকর্ণের পরবর্তী কাহিনী 'গুবিদায়' গল্পেও তাঁর ভূমিকা সামান্য। আসলে এই দুটি গল্পেরই প্রধান আকর্ষণ লম্বকর্ণ। তবে প্রথম গল্পে কেদার চাটুজ্যের একটি অনন্য সংযোজন আছে, সম্ভবত অজ - ব্যাঘ্র কাহিনীর সম্পর্ক নির্দেশ--- 'আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হল ইয়া, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ --- লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম--- দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর---কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিদ্দেশ। খোঁজ - খোঁজ কোথা গেল একবচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়। দেখা দিয়েছে মশায় --- আঁজি আঁজি ডোরা- ডোরা। ডাকা হল --- ভুটে ভুটে! ভুটে বললে হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার করে ফিরে এল।'

মজিলপুরের চরণ ঘোষ চাটুজ্যেমশায়ের গল্পে বারবার ফিরে আসেন। কিন্তু সত্যিকারের বাঘের গল্প 'দক্ষিণরায়' চরণ ঘোষের মেসো বকুলাল দত্তের গল্প। এখানে ছাগলের বাঘে রূপান্তর নয়, মানুষের বাঘে রূপান্তর। তার সঙ্গে রায়মঙ্গল কাব্যের খণ্ডাংশ। প্রথমে মনে হয়েছিল বাঘের সাহেব ধরে খাওয়ার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ আছে। পরে বংশোলোচনবাবুর কথাতে, অথবা গল্পের নিজস্বগতিতে, বকুলালবাবুর কাহিনী আজগুবি গল্প হয়ে উঠেছে। বকুলাল - রামজাদুর নির্বাচনযুদ্ধে দল - আদর্শ - মতামত সব কিছু তুচ্ছ। সেই রামরাজ্যে 'শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই - ব্রাদার। দিব্যি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।' দেশের হিত - টিত - টিত আদৌ বিবেচ্য নয়, একমাত্র লক্ষ্য 'রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।' তারপর বকুলাল দক্ষিণরায়ের কৃপায় বাঘ হলে গেলেন। ---'বকুলাল কেঁদেই অকুল। ও বাবা, একি করলে? গিন্নি যে চিনতে পারবে না গো!' গল্পের শেষে,

বিনোদবাবু বলিলেন---- 'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খেয়েছেন?'

'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি?'

'দেখ বিনোদ, ঠাকুর - দেবতার কথা নিয়ে তামাশা কোনো না, তাতে অপরাধ হয়, আচ্ছা বোসো তোমরা --- আমি উঠি।'

'দক্ষিণরায়' গল্পটি চাটুজ্যেমশায়ের শোনা কিংবা বানানো ঠিক বোঝা যায় না। তবে তিনি ইচ্ছে করলে গল্প লিখতে পারতেন, আর সে গল্প সব সময়েই সত্যভিত্তিক--- 'গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।' 'স্বয়ম্বরা' হচ্ছে 'একটি নিছক সত্য প্রেমের কথা', তবে চাটুজ্যে মশায়ের নিজের প্রেমের অভিজ্ঞতা নয়, ট্রেনে এক অপরূপ সুন্দরী মেমস

াহেব আর তিনজন সাহেবের প্রেমোপাখ্যান। চাটুজ্যেমশায় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গল্পে মেমস াহেবের বর্ণনাটি অসামান্য -- 'মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেল কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত ঘাড় - ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মত দু'গাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটা দেড়হাতি গামছা--- ...পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো করে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপি কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম --- হ্যাঁ যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক - কোমার অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একেব ারে জ্বলন্ত হাউইএর কাঠি।' প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিতের বর্ণনাশক্তির সঙ্গে চাটুজ্যেমশায়ের বর্ণনাশক্তি তুলনীয়।মেমস াহেবের নাম জোন জিলটার, দু'জন কোটিপতি আমেরিকান টিমথি টৌপার ও ক্রিস্টফার কলম্বাস ব্লটো তাঁকে বিয়ে করতে চান।তবে শেষ পর্যন্ত এদের পরিবর্তে বিল বাউণ্ডারকে বিয়ে করবেন মেমসাহেব এমনটা স্থির হলে চাটুজ্যেমশায় হবু বর - কনেকে আশীর্বাদ করলেন----

সাহেবের মাথায় এক মুঠে ঘাস দিয়ে বললুম --- বেঁচে থাকো। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষী এই সঁপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা বেশি মদ - টদ খেয়ো না, তাহলে ব্রহ্মশাপ লাগবে....।

মেমকে বললুম--- মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক। বীরপ্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা -- ও আশীর্বাদটা আম াদের অবলাদের জন্যে তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা -- আদমিদের দুঃখের নিমিত্ত হোয়ো না --- গুটিকতক শ ান্তশিষ্ট কাচচাবাচচা নিয়ে ঘরকন্না করো।

গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তটি এসেছে পাত্রীকে আশীর্বাদের পর---- 'মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু করে আমার সেই পাঁচদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর---'। সত্যিই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে, আর এই ক্যাদ ার চাটুজ্যে। বৈঠকিগল্প কি করে জমাতে হয় তা জানতেন পরশুরাম।

'দক্ষিণরায়' ও 'স্বয়ম্বরা'র সঙ্গে তুলনায় 'রাতারাতি' একটু ম্লান মনে হবে। যদিও এখানে চাটুজ্যেমশায় প্রমাণ করেছেন, তিনি বয়সে প্রবীন হলেও মনের দিক থেকে প্রবীন - তণ অর্থাৎ বঙ্কিম চাটুজ্যে ও শরৎ চাটুজ্যের সমগোত্রের (এঁদের কারও দাড়িও নেই গোঁফও নেই)। চরণ ঘোষ তাঁর ছেলে কার্তিককে নিয়ে দুশ্চিন্তিত, প্রথমে সে দুশ্চিন্তা ছিল ছেলেধরা যদি তাকে ধরে নিয়ে যায়, পরেতিলোত্তমা নারীর সন্ধানে পুত্রের ব্যাকুলতা দেখে বিভ্রান্ত। চাটুজ্যেমশায় অনেক কষ্টে চরণ ঘোষকে স ামলালেন, কিন্তু কার্তিককে সামলানো সহজ নয়। কার্তিকের বন্ধুদের সঙ্গে তিনি জিগীষা দেবীর বাড়ি গেছেন এবং তণদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছেন। হাসির গল্পে অতিরঞ্জন থাকতেই পারে, তবে পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' বা 'স্বয়ম্বরা' গল্পে সেই অতিরঞ্জনের পিছনে কোনো প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতা কাজকরেনি। 'মহেশের মহাযাত্রা' থেকে বক্তব্য প্রকট হয়েছে। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পকে সব সময়ে উদ্দেশ্যহীন বলা যাবে না, শ্যামানন্দ্র ব্রহ্মচারী - বিরিঞ্চিবাবা কৌতুকের আবরণে মানুষের চাতুর্য - লোভ - প্রতারণা ইত্যাদির জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর পাশে আছে জাবালি, প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় পরশুরামের symbolic Hero। কিন্তু ক্রমশ দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মধ্যে দেখা দিয়েছে কিছুটা অসহিষ্ণুতা। 'ভুষণ্ডীর মাঠে' সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু 'রাতারাতি' সেভাবে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। 'মহেশের মহাযাত্রা' গল্পের মহেশ মিত্তির মরে প্রমাণ করলেন, তিনি মরেননি---- 'ও হরিনাথ --- আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি----'। অবশ্য ভূতের গল্পের ভূতকে প্রমাণ করার কয়েকটি সহজ পথ আছে,এখানে পরশুরাম যেন কিছু সহজ পথ অবলম্বন করেছেন। তা না হলে যথার্থ ভূতের গল্প তিনি লিখতে পারতেন, ভূষণ্ডীর মাঠের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই। এমন কি 'একগুঁয়ে বার্থা' ভালো বৈঠকি ভূতের গল্পের দৃষ্টান্ত হতে পারে।

পরশুরাম নিটোল ছোটগল্প লিখতে পারতেন। তবু কোথাও একটা ঝোঁক তাঁর মধ্যে কাজ করেছে, দেশজ ফরমায়েশি তথা বৈঠকি গল্প রচনার দিকে। শুধু এই গল্পগুলি স্বতন্ত্রভাবে বেছে নিলে বাংলা অন্যধারার গল্পের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অ ামরা রসগ্রাহী পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com